রামরাজত্বে মৈথিলীর উপাখ্যান

মূল রচনা

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অনুলেখন

নূপুর গঙ্গোপাধ্যায় লাহিড়ী

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

অনুলেখকের সূচনা

১৯৮০ সালের এগারোই জুন আমার বাবা নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সুদূর আমেরিকায় এসে আমারই বাড়িতে প্রয়াত হন। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

পিতৃবিয়োগে বিষাদে জর্জরিত হয়ে আমি কাটাই অনেক বছর। যখনই আমেরিকা থেকে কলকাতায় গিয়েছি খুঁজে ফিরেছি বাবার এতটুকু চিহ্ন আমাদের যতীন দাস রোডের পৈতৃক বাড়িতে। ঘরে ঘরে ঘুরেছি, বইয়ের আলমারি ঝেড়েছি। বাবার ধুলোভরা লেখার টেবিলে পড়ে থাকা টুকরো কাগজ কুড়িয়েছি।

এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে একবার পেয়ে গেলাম একটি খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা। খুলে দেখি বাবার হাতে লেখা আবছা হয়ে আসা নীল কালিতে ভরা পাতার পর পাতা। যখন পড়তে শুরু করলাম দিন শেষ হয়ে গেল, রাত গভীর হল। পড়া থামাতে পারলাম না। আমার চোখের জলে অস্পষ্ট লেখা আরো অস্পষ্ট হয়ে উঠল।

এযে এক মহান উপাখ্যান! রামরাজত্বে মৈথিলীর উপাখ্যান।

১৯৭৯ সালের এপ্রিলমাসে নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় এই পাণ্ডুলিপি শুরু করেন। ভগ্নস্বাস্থ্য ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে লেখা শুরু করেন। লেখার মাঝে মাঝে হাত কেঁপেছে। কিছু অংশ আমার ছোটো বোনের হাতে লেখা, বাবার মুখের কথা শুনে শ্রুতিলিখন। কোনো কোনো অংশে পুনরাবৃত্তি ও অসংলগ্নতা দেখতে পেয়েছি। ১৯৭৯ সালের ১৭ নভেম্বরে এই পাণ্ডুলিপির দুই-তৃতীয়াংশে তিনি পৌছন।

অসমাপ্ত থেকে যায় এই প্রচেষ্টা।

আমি গত কয়েক বছরে এই পাণ্ডুলিপির অনুলিখনের চেষ্টা করে এসেছি। অস্পষ্ট লেখা ম্যাগনিফাইং লেন্সের মধ্যে দিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি। মূল লেখার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও পুনরাবৃত্তি ছিল, তা সংস্করণ করেছি। শেষের দিকের অসমাপ্ত পরিচ্ছেদগুলি লেখকের মূল ধ্যানধারণা অনুসরণ করে শেষ করেছি।

পিতৃস্মৃতি রক্ষার জন্য এ আমার আর এক প্রয়াস। এই পাণ্ডুলিপি আজ পুনরুদ্ধার করে আমি প্রয়াত নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই অসাধারণ বিশ্লেষণভিত্তিক রচনা আজ পাঠকবৃন্দের কাছে আনতে পেরেছি, যার জন্য আমি পরিতৃপ্ত ও চিরকৃতজ্ঞ। আমার নিশ্চিত ধারণা যে নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার অনুরাগী পাঠকেরা এবং অন্যান্য নতুন পাঠকবৃন্দ এই বইটি উপভোগ করবেন।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মূলত ভ্রমণ সাহিত্যিক হিসেবেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "...ভ্রমণ কাহিনীতেই প্রমাণ পাওয়া যায় লেখকের বৈদগ্ধ্য ও ইতিহাস চেতনা।"

নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রমণ ও ঐতিহাসিক লেখার মধ্যে পাওয়া গেছে গবেষণামূলক তথ্য ও বিশ্লেষণ। তাঁর নির্মল নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা সত্য ইতিহাস আর কাল্পনিক পুরাণের মধ্যে সৃষ্টি করে এক আশ্চর্য সেতুবন্ধন।

তাঁর এই লেখনশৈলীর উদাহরণ পাওয়া যায়, পূর্বপ্রকাশিত হেলেন ট্রয়ের হেলেন, চান্দেল্যস্মৃতি, খাজুরাহো ও জালিয়ানওয়ালাবাগ গ্রন্থে। বহু গবেষণার ফলে শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের মূল তথ্যের সূত্র ধরে প্রচলিত জনশ্রুতি, প্রবাদ ও কল্পনাপ্রসূত অলৌকিক ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন।

কুসংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি সমাজব্যবস্থার সঙ্কীর্ণতা ও কুবিচারের অনুমোদন হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় স্তোত্র ও পুরাণে। এই যুগান্তে এসেও আজকের সমাজ অন্ধবিশ্বাস নিয়ে সেই প্রাচীন প্রথা ও নীতির সংশোধন বা বিবর্তন করে নি। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় আজও হয়ে আসছে বধূহত্যা, নারী নিপীড়ন ও অবজ্ঞা। তারই সঙ্গে চলে আসছে ক্ষমতালোলুপ প্রশাসন তন্ত্রের অবাধ প্রশ্রয়। নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণ মহাকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক দৃঢ় প্রগতিশীল চিন্তা নিয়ে সৃষ্টি করেছেন রামরাজত্বে মৈথিলীর উপাখ্যান।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আমার চেয়ে বছর কয়েকের বড়ো ছিলেন। আমরা তাঁকে নির্মলদা বলতুম। যেমন ভালোবাসতুম, তেমন তাঁকে শ্রদ্ধাও করতুম খুব। যদি বলি যে, আমাদের সময়কার অনেক ছাত্রেরই তিনি 'রোল মডেল' ছিলেন, তো একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। তাঁর বাবা ছিলেন সেকালের একজন নামজাদা বাস্তুবিদ ও একটি বিদেশি সংস্থার অতি উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তি। দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস রোডে নির্মলদার বাড়িতে তো সেই চল্লিশের দশকে বারকয়েক গিয়েছি। গেলেই বোঝা যেত যে, এই পরিবারটির বিত্তসম্পদ নেহাত কম নয়। অথচ তাঁর কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে কোনও বড়োলোকি মেজাজের ছিটেফোঁটাও কখনও দেখিনি। বিত্ত নয়, মানুষটি ছিলেন বিদ্যার উপাসক। ইতিহাসের তুখোড় ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তাঁর ফল ছিল সম্ভ্রম জাগানোর মতো।

কৃতী ছাত্র তো ছিলেনই, উপরন্তু ছিলেন সাহিত্যপ্রাণ মানুষ। সেকালে 'শ্রীহর্ষ' বলে একটি কাগজ বার হত। এটি ছিল ছাত্রসমাজের মুখপত্র। বার হত বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায়। নির্মলদা তাঁর ছাত্রাবস্থায় বাংলা 'শ্রীহর্ষ' সম্পাদনা করেছেন, এবং লিখেছেন বেশ-কিছু রচনা। পরবর্তীকালেও তাঁর কলম থেমে থাকেনি। বাঙালি পাঠকসমাজ অবশ্য তাঁর নর্মদা-পর্বের ভ্রমণ-সাহিত্যের সঙ্গেই সর্বাধিক পরিচিত। তার বাইরেও কিন্তু তাঁর প্রচুর লেখা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সেগুলিকে যদি একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয় তো দেখা যাবে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর দখল নেহাত কম ছিল না।

পুনশ্চ থেকে প্রকাশিত এই বইটিই অবশ্য তাঁর শেষ রচনা। এর সবটাই যে তিনি নিজে লিখেছেন, তা নয়। রচনা শেষ হবার আগেই তিনি মারা যান। ফলে, যতটা তাঁর নিজের লেখা, তার সূত্র ধরে ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শেষাংশ লিখতে হয়েছে অন্যজনকে। সেই অন্যজন নির্মলদারই জ্যেষ্ঠা-কন্যা নূপুর। তা নূপুরকেও তো বেশ কিছুকাল ধরে আমি চিনি। এটাও জানি যে, পিতৃসূত্রে তারও সাহিত্যবোধ ও রচনাশক্তি কিছু কম নয়। বইয়ের প্রথমাংশের সঙ্গে শেষাংশ তাই দিব্যি মিলে গেছে, কোথাও হোঁচট খেতে হয় না।

এ-বইয়ে রামায়ণ-মহাকাব্যটিকে যে-দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে ও বিচার করা হয়েছে তার নানা ঘটনা, সেটি নির্মলচন্দ্রের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ। তাঁর ভাবনা যে পাঠকদেরও আবার নতুন করে ভাবাবে তাতে সন্দেহ করি না।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিদেহরাজের কন্যা, অযোধ্যারাজের পুত্রবধূ, সর্বগুণাধার ক্ষত্রিয়তিলক রামের সহধর্মিণী সীতা। আদি কবি বাল্মীকির মানসকন্যা, আদি মহাকাব্য রামায়ণের নায়িকা।

দস্যু রত্নাকর দীর্ঘ দুঃসহ তপস্যা করে পাপ-বিমুক্ত হয়েছিলেন। তপস্যাকালে তাঁর সমস্ত দেহ বল্মীকে ঢেকে গিয়েছিল। তাই তাঁর নাম বাল্মীকি। মুছে গিয়েছিল তাঁর রত্নাকর নাম। দস্যু ঋষিরূপে নবজীবন লাভ করেছিলেন। ঋষি বাল্মীকি ভেবেছিলেন দুষ্কর তপশ্চর্যাতেই তাঁর আয়ুষ্কাল উত্তীর্ণ হবে। নিভৃত নির্জনবাস পাপের পুনরাক্রমণ থেকে তাঁকে বাঁচাবে। আর কখনো পা বাড়াবেন না জনসমাজের অভিমুখে। কেউ মনে না রাখুক তাঁর নাম, কোনো পুরাণে উল্লিখিত না হোক তাঁর কাহিনি।

পুরাণে কত মুনি-ঋষির নামোল্লেখ, তাঁদের কত কীর্তির ব্যাখ্যান। কিন্তু বাল্মীকি উল্লেখহীন। বাল্মীকি ক্ষুব্ধ নন তাতে। তিনি পাপমুক্ত মাত্র, পুণ্যাত্মা নন। তপস্যা পশুশক্তির হাত থেকে তাঁকে মুক্ত করেছে, কিন্তু কোনো অতিমানবের পর্যায়ে তাঁকে উন্নত করে নি। যিনি বর দিতে পারেন না, অভিশাপ দিতে পারেন না, কোনো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী যিনি নন, নিতান্ত আত্ম-অপরাধ ক্ষালনের জন্য যিনি মুনিব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁকে সমাজের প্রয়োজন কী, তাঁর প্রতি কৌতূহলী হবে কোন কাহিনিকার?

একদিন স্নানার্থে তমসাতীরে চলেছেন বাল্মীকি। চোখে পড়ল একটি ক্রৌঞ্চমিথুন। নিবিড় বনের নিভৃতে দুটি পাখি পরম সুখে বিহার করছে। দুঃখমৃত্যুময় নশ্বর জীবনের অমৃতস্বাদ তারা উপভোগ করছে। বিহার সারা হল না, পরিতৃপ্তি সম্পূর্ণ হবার আগেই দূর থেকে তির ছুঁড়ে এক ব্যাধ ক্রৌঞ্চটিকে বধ করল। প্রিয়হারা ক্রৌঞ্চী ভগ্নকণ্ঠে বিলাপ করতে লাগল।

সংসার বিরাগী তপস্বীর চোখে এক মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল প্রেম আর

অপ্রেম, জীবন আর মৃত্যু, মিলন আর বিরহশোক। অতর্কিতে তাঁর মুখ থেকে ধ্বনিত হল শাপ। নিষ্ঠুর ব্যাধকে বাল্মীকি অভিশাপ দিলেন।

অস্বাভাবিক ব্যবহার নয়। মুনিঋষিরা ক্রুদ্ধ হলেই অভিশাপ দেন, ক্রোধের কারণ গুরুতর হোক আর যৎসামান্য হোক।

বিরহিনী শকুন্তলা কণ্ব মুনির আশ্রমে বসে দুষ্মন্তের ধ্যান করছেন, এদিকে আশ্রমদ্বারে দুর্বাসা মুনি। দুর্বাসার দিকে তার চোখ পড়ল না। মুহূর্তের জন্যে আপ্যায়ন ব্রত থেকে তিনি বিচ্যুত হলেন। কী অপরাধ তা ভালো করে বোঝবার আগেই দুর্বাসার অভিশাপে অন্ধকার নেমে এল শকুন্তলার জীবনে। স্ত্রী-সংগমরত কিমিন্দম মুনিকে হরিণভ্রমে হত্যা করেছিলেন পাণ্ডু। মৃত্যুকালে মুনি তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সংগমকালে অতৃপ্ত অবস্থায় তুমিও শমনদ্বার দেখবে।

বাল্মীকির শাপের তেজও ছিল না। তাঁর রোষবহ্নিতে ব্যাধ ভস্মও হয়ে যায়নি, যদিও ভ্রমক্রমে নয়, ইচ্ছে করেই সে ক্রৌঞ্চের গায়ে তির নিক্ষেপ করেছিল। বাল্মীকি বলেছিলেন, — নিষ্ঠুর ব্যাধ, ব্যাধজীবনে আর তুই প্রতিষ্ঠা পাবি না। এই অভিশাপের ফলে মনে হয় তার লক্ষ্যভেদের ক্ষমতাটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু অকিঞ্চিৎকর পাত্রে বর্ষিত এই অক্ষম অভিশাপ অমৃতধারার উৎস। এই অতর্কিত অভিশাপে ধ্বনিত হল ছন্দোময় সমাক্ষরবদ্ধ পরপর দুটি চরণ,— জন্ম হল শ্লোকের। নিজেরই কণ্ঠ থেকে এই পরমাশ্চর্য জন্ম, আপন শক্তিতে আশ্চর্য হয়ে গেলেন বাল্মীকি। আস্তে আস্তে বুঝলেন অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আকুতি থেকে উৎসারিত শ্লোকনিচয়ের নাম কাব্য। কতকাল ধরে বাল্মীকি তপস্যা করেছেন,— এতদিন করেছেন নীরব নির্বাক তপস্যা। এবার তপস্যা শব্দের, বাক্যের। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে বাঙ্ময় শ্লোক রচনা করবেন,শ্লোকের পর শ্লোক গেঁথে তিনি কাব্যরচনা করবেন। নবজীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন বাল্মীকি। অভিশাপের শক্তির চেয়ে মহামহত্তর শক্তির অধিকারী হয়েছেন।

কিন্তু কী হবে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু? সুখ আর দুঃখ, প্রেম আর বঞ্চনা, মিলন আর বিরহ সংসারের উপাদান। সংসার কাহিনি ছাড়া কাব্য কাহিনি হয় না। কিন্তু সংসারের কোনো খবর রাখেন না দীর্ঘতপা আদি কবি?

ইতিপূর্বে এক সংসার কাহিনি বাল্মীকি শুনেছেন নারদের মুখ থেকে। নারদ বাল্মীকিকে সংক্ষেপে রামচরিত্র শুনিয়েছেন। নির্বাসন ও বনবাস, রাবণ কর্তৃক পত্নীহরণ, রাবণবধ, লঙ্কাজয় ও পত্নী উদ্ধার, স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন ও সিংহাসন লাভ, — রামের ঘটনাসংকুল জীবনের সংক্ষিপ্তসার তাঁর জানা। রামের রূপগুণের বর্ণনাও নারদ দিয়ে গেছেন। বিশাল রামের শরীর,—বিস্তৃত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, উন্নত শির,—স্নিগ্ধ তাঁর দেহবর্ণ, প্রতি অঙ্গে তিনি কান্তিমান। রাম সর্বগুণান্বিত,

—ধর্মক, সত্যনিষ্ঠ, সংযতচিত্ত, শুদ্ধাচারী, জ্ঞানী। তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণ তিনি মহাবীর অরিন্দম। রূপে গুণে তিনি অতুলনীয়।

বাল্মীকি প্রেরণা পেলেন। স্থিরনিশ্চয় হলেন রামই তাঁর কাব্যের উপযুক্ত নায়ক। রামের বিচিত্র চরিত্র তিনি রচনায় উদ্ঘাটন করবেন, তাঁর বিচিত্র জীবন তাঁর কাব্যে বর্ণিত হবে। বিশ্বজনের কাছে তাঁর নায়ককে নবচন্দ্রমা রূপে বিখ্যাত করবেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংসারের পথে রামের পরিক্রমা। রামের অয়ন, — রামায়ণ।

কিন্তু যে চকিত পর্জন্যধারা তাঁর কাব্যের উৎস, নায়কচরিত্রের শিলাকাঠিন্যের বাধায় তা কি রুদ্ধ হবে না, ঘটনাঘটনে ঊষর মরুতে তা কি শুকিয়ে যাবে না? নারদ ঘটনা শুনিয়েছেন,—অনুভূতি তো জাগাতে পারেন নি? রামের রাজ্যত্যাগের কথা বলেছেন, দশরথের পুত্রশোকের কথা তো প্রকাশ করতে পারেন নি, কৈকেয়ীর হিংসার কথা বলেছেন শোকাতুর কৌশল্যার বেদনার ছবি তো আঁকতে পারেন নি।

সীতাহরণ উল্লেখ করেছেন, রাম-সীতার বিরহ যন্ত্রণার চিত্র তো ফোটাতে পারেন নি। নারদের বর্ণনায় ঘটনা আছে, হৃদয় নেই। হৃদয় ছাড়া কাব্য হয় না, হৃদয়ের কথা কে তাঁকে বলবে? প্রেম থেকে অপ্রেম, মিলন থেকে বিচ্ছেদ, সুখ থেকে বঞ্চনার অবশ্যম্ভাবী ধারাটিকে কেমন করে তিনি সঞ্চারিত করবেন তাঁর শ্লোকরাজিতে? বেদনাবিধুর কোন কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদে কল্লোলিত হবে তাঁর সংগীত? তাঁর মহাকাব্য জুড়ে কে ধারণ করে রাখবে ক্রৌঞ্চীর বিচ্ছেদ বিলাপ?

নদীতীরে ঋষি আশ্রম, বাল্মীকির আবাস। নারীকণ্ঠের রোদন-ধ্বনি শুনে বাল্মীকি তাঁর কুটির থেকে বার হয়ে এলেন। এগিয়ে এসে দেখলেন এক পরমাসুন্দরী নিঃসঙ্গিনী নারী ধুলায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে। নিষ্ঠুর নাবিক তাকে নদীর এপারে ফেলে রেখে তার তরি নিয়ে ওপারে ফিরে যাচ্ছে।

পায়ে পায়ে কাছে পৌঁছলেন ঋষি।

মুখ তোলো মা, চোখ মোছো। কে তুমি?

রাহুগ্রাসে কলঙ্ক পাণ্ডুর পূর্ণ চন্দ্রভাতি।

ও মুখ আগে না দেখলেও চিনতে অসুবিধে হল না বাল্মীকির। ও মুখ সীতার। এই তো সবে লঙ্কা জয় করে রাম অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন, সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর সঙ্গে ফিরেছেন ভাই লক্ষ্মণ আর পত্নী সীতা। লক্ষ্মণ রাজভ্রাতার মাথায় রাজছত্র ধরেছেন, সীতা কণ্ঠে পরেছেন রত্নহার। অভিষেক আড়ম্বরের